ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454-1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 28-33
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.431

পুরুষার্থভাবনা: প্রেক্ষাপট ন্যায়দর্শন

সুধন দাস, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 06.03.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The concept of Purushartha represents a fundamental ethical framework in Indian philosophy, referring to the ultimate goals or ends of human life. It encompasses both the ideals that individuals ought to pursue and those that are naturally desired. All systems of Indian philosophy acknowledge such values and classify them into four categories: Dharma, Artha, Kama, and Moksha.

Dharma denotes moral and ethical duties, guiding righteous conduct. Artha signifies material prosperity and economic well-being, to be pursued within legitimate limits. Kama refers to desires, particularly sensuous and emotional fulfillments. Above all, Moksha is regarded as the supreme goal, representing liberation from the cycle of suffering. Although various philosophical systems interpret Moksha differently—using terms such as Nirvana, Kaivalya, and Apavarga—a common understanding persists. In the Nyaya system, liberation is not characterized by positive bliss but by the complete cessation of all suffering (tadatyanta-vimokṣaḥ apavargaḥ).

Keywords: Purushartha, Moksha, Dharma, Suffering, Self-Realization, Value

ভারতীয় মুনি-ঋষিগণ জগৎ ও জীবনের যে সত্যকে তাঁদের সাধনায় উপলব্ধি করেছেন সেই উপলব্ধ সত্যকে তাঁরা সেইভাবে ব্যক্ত করেছেন, এই উপলব্ধির ফলশ্রুতি হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের। ভারতীয় দর্শনের সম্প্রদায়গত পরম্পরায় জিজ্ঞাসা হল মানুষের স্বরূপের জিজ্ঞাসা, মানবজীবনের পরমলক্ষ্যের জিজ্ঞাসা, জগৎ সৃষ্টি, আদি রহস্যের জিজ্ঞাসা। এই সমস্ত উপলব্ধ সত্যের ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। ভারতীয় দর্শনের চার্বাক দর্শন সম্প্রদায় ছাড়া বাকি সকল দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি সচেষ্ট হয়েছেন কিভাবে মানুষকে দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায়। কারণ, তারা একথা বুঝেছেন যে দুঃখ হল অনিবার্য সত্য এবং দুঃখ বিভিন্ন কারণ থেকে আসে ফলে এই দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ ঘটলে মানুষ তার চরম বা পরম লক্ষ্যকে উপলব্ধ করে। ভারতীয় দার্শনিকগণ এই চরম বা পরম লক্ষ্যকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরুষার্থের আঙিনায় দেখেছেন।

পুরুষার্থ হল যে বস্তু পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে তাই পুরুষার্থ। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রর্বত্ততে, স পুরুষার্থঃ' অর্থাৎ পুরুষ যা কামনা করে বা জীবনে যা লাভ করতে চায় তা হল পুরুষার্থ।[১] এই প্রসঙ্গে মহর্ষি জৈমিনি তাঁর 'মীমাংসাসূত্র' গ্রন্থে (৪/১/২) বলেছেন 'যস্মিন্ প্রীতিং পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থলক্ষণঃ অবিভক্তত্বাৎ'- অর্থাৎ যে বিষয়ে মানুষের প্রীতি হয় তাই পরুষার্থ, তার যে লিপ্সা বা অনুষ্ঠান তা স্বাভাবিক অনুরাগের মাধ্যমে প্রাপ্ত।[২]

ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুরুষার্থের বিভাগরূপে কখনো ত্রিবর্গের কথা বলা হয়েছে (ধর্ম, অর্থ, কাম) আবার চতুর্বর্গকে (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা মুক্তি) স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে সাধারণত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পুরুষার্থ বলে গণ্য করা হলেও এর মধ্যে কখনো কখনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারো কারো মতে ধর্ম ও অর্থই শ্রেষ্ঠ আবার কারো কারো মতে কাম ও অর্থ, আবার কারো কারো মতে কেবল ধর্মই শ্রেষ্ঠ। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয়শাস্ত্রে মোক্ষ বা মুক্তি কে পুরুষার্থ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই মোক্ষের আদর্শ উপনিষদের মতোই প্রাচীন। সাধারণ মানুষ যারা পরমপুরষার্থরূপে মোক্ষের ব্যাপারে ততোটা আগ্রহী নয় তাদের কথা ভেবে শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। বৈদিক মুনি-ঋষিরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটির মূল্যবোধের কথা বলেছেন, এইগুলিকে বলা হয়েছে পুরুষার্থ।

ধর্ম: বৈদিক সমাজের নৈতিক নিয়মগুলির ভিত্তি হল ধর্ম। ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্মকে প্রথম পুরুষার্থ বলা হয়েছে। ভারতীয় শাস্ত্রে ধর্মপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যা সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে তাই ধর্ম। 'ধর্ম বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা'।[৩] মনুসংহিতায় (৪/১৩৮) শ্লোকে বলা হয়েছে-

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ৎ ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্
প্রিয়ং চ নানৃতম ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।" মনুসংহিতা (৪/১৩৮)

অর্থাৎ অপরকে আঘাত না করে যা সত্য ও প্রিয় তা বলা উচিত, যদিও অপ্রিয়সত্য বলা উচিত নয়, প্রিয় হলেও মিথ্যা বলা উচিত নয়, সনাতন ধর্ম এ কথা বলে।[৪] মীমাংসামতে বেদবাক্যের দ্বারা জ্ঞাপিত কর্মই ধর্ম ('চোদনা লক্ষণার্থ ধর্মঃ')। ধর্ম বিষয়ে মীমাংসা সম্প্রদায় বেদবাক্যকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। গৌতম তাঁর 'ধর্মসূত্র' গ্রন্থে বলেছেন শুধুমাত্র যাগযজ্ঞাদি কর্মের চেয়ে আত্মগুণ বলে পরিচিত, দয়া ও পবিত্রতার স্থান অনেক উঁচুতে।

ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলা হয়েছে 'অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, শান্তি' এই নয়টি ধর্মের সাধনার কথা[৫] সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ধর্ম লক্ষ করা যায়, এই গোষ্ঠীবর্ণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি স্থাপনের জন্য ধর্মকে একটি সামাজিক ও নৈতিক বিধি বলে স্বীকার করা হয়েছে, যাকে আধুনিক পরিভাষায় ন্যায়ধর্ম বলা হয়, তাকে ভারতীয় দর্শনে ধর্ম বলা হয়েছে। আবার আমরা দেখতে পাই যে, ধর্ম শব্দটি পরাতাত্ত্বিক অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। পরাতাত্ত্বিক অর্থে ধর্ম শব্দটির ব্যবহার বিশ্বজাগতিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার ভিত্তি রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এই নীতি 'ঋত' নাম পরিচিত। এই মহান নীতি বিশ্বকে পরিচালনা করে এবং দেবতা, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র আদি ও সমস্ত প্রাণী এই নিয়মে পরিচালিত।

---

[১] যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রর্বত্ততে, স পুরুষার্থঃ' শাস্ত্রী, পঞ্চানন: চার্বাকদর্শন, পৃষ্ঠা-১৬

[২] যস্মিন প্রীতিং পুরুষস্য তস্য লিপ্সার্থলক্ষণ অবিভক্তত্বাৎ।'- ভট্টাচার্য, সুখময়: পূর্ব মীমাংসা দর্শন, পৃঃ ৯৪

[৩] ধর্মঃ বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা।"ভট্টাচার্য, গোপীনাথ: ভারতীয় দর্শন ও তার নির্দিষ্ট পটভূমিকা, পৃঃ ৫৪

[৪] সত্যৎ ব্রূয়াৎ প্রিয়ৎ ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্ প্রিয়ৎ চ নানৃতম ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ - মনুস্মৃতি(৪/১৩৮)

[৫] অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, দম দয়া, শান্তি।"Hiriyanna. m philosophy of values. পৃষ্ঠা 647

মানুষ যে বিভিন্ন আচরণ করে থাকে এই আচরণের ক্ষেত্রে ধর্ম নিয়ন্ত্রক। যেমন কাম ও অর্থ পুরুষার্থ দুটি যদি ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হত, তাহলে সমাজের মানুষ বিপদগামী হতে পারত এবং এর ফলে সমাজের কল্যাণ আর্দশ বিঘ্নিত হত।

ধর্ম শব্দটি আবার কর্তব্য অর্থেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কর্তব্যের শুধু যে নৈতিক দিক আছে তা নয়, সামাজিক দিক রয়েছে। একথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে মানুষ শুধুমাত্র নৈতিক কর্তা রূপে কর্তব্য পালন করবে শুধু তা নয়, লক্ষণীয় যে, সমাজে তার আশ্রম ও বর্ণ অনুযায়ী কর্তব্য নির্ধারিত হয়। আশ্রম শব্দটির দ্বারা জীবনযাত্রার প্রণালীকে বোঝানো হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র ও মহকাব্যে আশ্রমের কথা বলা হয়েছে ব্রক্ষচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আবার 'বর্ণ' শব্দটির দ্বারা মানসিক প্রবণতা কে বোঝানো হয়েছে। এই প্রবণতা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই ভাগ করা হয়েছিল।[৬]

মনু সর্বপ্রথম ধর্মকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম। মনু মনুসংহিতায় (৬/৯০) সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করেছেন তা হল-

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্।"[৭]

অর্থাৎ ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা (অপরাধ মার্জনা), দম (সহনশীলতা), অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (দেহ ও মনের শুচিতা), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (ইন্দিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্র জ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ মনুর মত প্রশস্তপাদও ধর্মকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন- সামান্য ধর্ম ও বিশেষ ধর্ম। সামান্য ধর্ম সকল মানুষের পালনীয়। বিশেষ ধর্মের পালন সামাজিক অবস্থান সাপেক্ষে হয়ে থাকে। প্রশস্তপাদ যে সামান্য ধর্মগুলির উল্লেখ করেছেন তা হল ধর্মে শ্রদ্ধা, অহিংসা, ভূতহিতত্ব, সত্যবচন, অস্তেয়, বক্ষচর্য, অনুপধা, ক্রোধবর্জন, স্নান বা অভিশেচন, শুচিদ্রব্য সেবন, বিশিষ্ট দেবতা ভক্তি, উপবাস, অপ্রমাদ।

অর্থ: সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য যে অর্থ প্রয়োজন আছে একথা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। ভারতীয় নীতি শাস্ত্রেও একথা অস্বীকার করা হয়নি। অর্থকে পুরুষার্থ রূপে গণ্য করে একথাই বলা হয়েছে ব্যক্তির প্রয়োজনে, পরিবারের দায়িত্ব পালনে, কর্তব্য সাধনের জন্য এবং ধর্ম পালনের জন্য অর্থ মানুষের কাম্য বিষয়। তবে অর্থের জন্য অর্থ কামনা করব এমনটা বিষয় নয়, তাই বলা হয় অর্থ স্বতঃমূল্যবান নয় বরং অর্থ পরতঃ মূল্যবান কেননা, কাম এবং ধর্ম এই দুটি পুরুষার্থ পালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাই অর্থ কামনার বিষয়, শরীরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে অর্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে। অর্থ না থাকলে আমরা পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহ করতে পারিনা। আমরা অনেক সময় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দুর্বল হয়ে পরি। শরীর যদি দুর্বল হয় তাহলে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিকাশ ব্যাহত হয় সুতরাং অর্থের অভাব ঘটলে ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য সাধন অসম্ভব হয়ে পরবে।

পুরুষার্থ প্রসঙ্গে অর্থ বলতে জীবিকা অর্জনের উপায়কে বোঝানো হয়। ভারতীয় নীতি শাস্ত্রে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্রক্ষচর্য আশ্রমের কথা বলা হয়েছে। ব্রক্ষচর্য আশ্রমে শিষ্য গুরু গৃহে বাস করে প্রথম ২৫টি বছর অর্থ উপার্জন কীভাবে করতে হবে তা শেখানো হয়। ব্রক্ষচর্যের পরবর্তী স্তর গার্হস্থ্য জীবন পরিচালনার জন্য অর্থ একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়। অর্থ বলতে এমন সম্পদ কে বোঝায় না, যা অন্যায় ও অসৎ পথে গ্রহণ করা হবে।

[৬] 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ' ভগবদ্গীতা (৪/১৩)।-স্বামী রামাসুখদাস: শ্রীমদভগবদগীতা পৃ: 305

[৭] ৬/৯২-শাস্ত্রী, বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু ,মনুসংহিতা পৃ: ৬২৬।

চৌর্য বৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত অর্থ এবং অসৎ উপায়ে দ্বারা গৃহীত অর্থ নীতিশাস্ত্র বিরোধী এবং অত্যন্ত নিন্দনীয়, এই ধরনের অর্থ সংগ্রহ পুরুষার্থ রূপে বিবেচ্য নয়। যে অর্থ অনৈতিক পথে অর্জিত তা পুরুষার্থ নয়, সেই অর্থকে পুরুষার্থ বলা হবে যা ন্যায় পথে অর্জিত। তাই মানুষকে এমন ভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে যাতে অপরের ক্ষতি না হয়। একমাত্র যে অর্থ সৎপথে অর্জন করা হয় তাই দানের যোগ্য। অন্যায় বা অসৎ উপায়ে যে অর্থ সঞ্চয় করা হয় সেই অর্থে কৃত যজ্ঞফল দান সম্ভব হয় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন দৈনন্দিন প্রয়োজনে যতটা অর্থ দরকার তার বেশি সঞ্চয় করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করবে সে অপরাধ প্রবণ ব্যক্তি সুতরাং নিজের প্রকৃত প্রয়োজনে এবং অন্যের উপকারে অর্থ ব্যয় করা উচিত। অর্থে এই সংযত ব্যবহারের জন্য ধর্মের নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যিক। ধর্মই মানুষকে সংযত জীবন যাপন দিতে পারে অর্থাৎ অর্থের সঠিক ব্যবহার একমাত্র ধর্মের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। অর্থ যখন ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তা পরম পুরুষার্থ রূপে মোক্ষের দিকে উপনীত হয়।

কাম: সাধারণ অর্থে কাম বলতে বোঝায় কামনা, ইন্দ্রিয় সুখ, লোভ প্রভৃতি কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে কাম বলতে বোঝায় যৌনসুখ অথবা দৈহিক সুখ। সাধারণ অর্থে যখন কাম শব্দটিকে বিচার করা হয় তখন দেখা যায় কাম যেন একটি প্রবৃত্তি যা চরিতার্থ জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মানুষ যতই ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে ইন্দ্রিয়ের ভোগ লিপ্সা ততোই বাড়তে থাকে।

মনস্তত্বে বিভিন্ন যে সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলা হয় তার মধ্যে একটি হল যৌন প্রবৃত্তি। এই যৌন প্রবৃত্তি তৃপ্ত না হলে জীবনে ভারসাম্য হারিয়ে যায়। তাই গার্হস্থ্য আশ্রমে বিবাহ প্রথার মাধ্যমে যৌন পরিতৃপ্তির কথা বলা হয়েছে কেননা, যৌন পরিতৃপ্তির মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো সম্ভব এবং সমাজের নানা রকম অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। তাছাড়া সন্তান উৎপাদনের জন্য, বংশ রক্ষার জন্য, কামের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে।

গার্হস্থ্য আশ্রমের দরকারী অর্থ উপার্জানের পদক্ষেপের জন্য ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রয়োজন, তেমনি পুরুষার্থ রূপে ধর্ম পালনের জন্য কামেরও প্রয়োজন। দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে পুরুষ ও নারী শ্রদ্ধা ও প্রেম ভালোবাসার দীক্ষা পেয়ে থাকে। দাম্পত্য জীবনে বিবাহ কোনো সাধারণ চুক্তি নয়, আবার আদান প্রদানের সম্পর্কও বলা যায় না, বিবাহ হল আধ্যাত্মিক জীবনের দুটি মনের মিলন। এই দাম্পত্য জীবনে যে প্রেম ভালবাসা প্রভৃতির প্রকাশ ঘটে তার মাধ্যমেই মানুষ স্বার্থপর জীবন থেকে পরার্থপরের দিকে অগ্রসর হয়ে মোক্ষের দিকে উপনীত হয়।

ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চার্বাকগণ কামকে পরম পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেছেন এবং অর্থকে গৌণ পুরুষার্থ রূপে স্বীকার করেছেন। চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ একমাত্র প্রমাণ। চার্বাকরা ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, পরজন্ম এসব স্বীকার করেনা কেননা, এসব ভন্ড পুরোহিতরা সৃষ্টি করেছেন নিজেদের জীবিকার নির্বাহের জন্য। চার্বাক মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারটি ভূতের স্বভাব সংমিশ্রনের ফলে জীবদেহের সৃষ্টি হয়েছে। জীব দেহ একবার বিলীন হলে তা আর পুনরায় ফিরে আসে না। তাই চার্বকরা বলেন-

> “যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ”।।[৮]

---

৮ সায়নমাধাকৃত ‘সর্বদর্শন’ সংগ্রহঃ পৃঃ -৩৬

মোক্ষ: ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ হল জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য এবং মুক্তির অবস্থা। এটি হল জন্ম মৃত্যুর চক্র অর্থাৎ সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার অবস্থা, যেখানে আত্মা চিরস্থায়ী শান্তি ও পরম আনন্দ লাভ করে। মোক্ষ হল জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও বন্ধন থেকে মুক্তি। মোক্ষের মাধ্যমে আত্মা তার প্রকৃত স্বরূপে ফিরে যায়, তা চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর এবং পরম আনন্দময়। মোক্ষ লাভের জন্য জ্ঞান এবং ধ্যানের আত্ম অনুসন্ধান দরকার। মোক্ষের মাধ্যেমেই সকল কর্মফল বা কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় মোক্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন যেমন-

- চার্বাক মতে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের সম্ভোগই পরম সুখ বা মুক্তি।
- বৌদ্ধ দর্শনে মোক্ষ বা নির্বাণ দুঃখের অবসান এবং পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি। এটি চেতনাময় জীবনের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তির অবস্থা।
- জৈন দর্শনে মোক্ষ হল আআর সম্পূর্ণ মুক্তি যেখানে আত্মা সমস্ত কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করে।
- সাংখ্য দর্শনে মোক্ষ হল আত্মর সম্পূর্ণ মুক্তি, যেখানে আত্মা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয় এবং প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।
- ন্যায় মতে দুখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি বা অপবর্গ।
- মীমাংসা মতে নিত্য সুখের অভিব্যক্তি মুক্তি।
- বেদান্ত দর্শনে মোক্ষ হল ব্রহ্মের সাথে আত্মার একাত্মতা। এখানে মোক্ষ মানে আত্মা ও ব্রহ্মের মিলন, যা চিরস্থায়ী শান্তি।

এখন আমরা মোক্ষ বা মুক্তি সম্পর্কে ন্যায় মত আলোচনা করব-

মহর্ষি গৌতমের প্রথম সূত্র থেকে জানা যায় যে অপবর্গ লাভই হল ন্যায় দর্শনের মূল লক্ষ্য।[৯] একুশ প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে ন্যায় এর পরিভাষায় বলা হয় মোক্ষ। আবার আত্মার মোক্ষলাভকে ন্যায়ের পরিভাষায় বলা হয় অপবর্গ। বস্তুত দেই ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হলে এবং আত্মা নিজ স্বরূপে অবস্থান করলে দুঃখের (২১ প্রকার) যে আধ্যাত্মিক নিবৃত্তি ঘটে তাকে বলা হয় অপবর্গ।[১০] ইন্দ্রিয়গুলি সব সময় বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় আর ইন্দ্রিয় যত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় ততই আমাদের বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মায় যার ফলস্বরূপ দুঃখও বাড়ে। আমরা যে কষ্ট পাই, আমরা যে যন্ত্রণা পাই, যা আমাদের পীড়া দেয় তা হল দুঃখ। বাধনা লক্ষণং দুঃখ।[১১] প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞান অপবর্গ লাভের সহায়ক মাত্র।

মহর্ষি গৌতম এর মতে ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কোন নিরপক্ষভাবে অর্থাৎ অপবর্গ লাভের মূল হেতু, প্রমেয় পদার্থগুলির মধ্যে জীবাত্মা প্রধান।[১২] জ্ঞানদ্বারা অপবর্গ হলো জীবাত্মারই ধর্ম। সংসারী জীব সবসময় মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা দেহকে আত্মা বলে নিশ্চয়ই করে, এরূপ নিশ্চয় হল যাবতীয় বন্ধনের কারণ এরূপ বন্ধন হল সুখ-দুঃখের হেতু, কেননা দেহকে আত্মা বলে ভুল করলে মিথ্যা জ্ঞান জন্মায়। দেহাদিতে আত্ম নিশ্চয় আছে বলে দেহাদি অনুকুল বিষয়ে রাগ এবং প্রতিকুল বিষয়ে দ্বেষ জন্মায়।[১৩] এই রাগ ও দ্বেষ দোষ

---

৯ প্রমাণ - প্রমেয়-সংশয়- প্রয়োজন- দৃষ্টান্ত- সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প- বিতন্ডা-হেত্বাভাসছেল-জাতি-নিগ্রহ স্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানিম্নিঃ শ্রেয় সাধিগম ॥ন্যায় সূত্র-১॥

১০ তদত্যন্ত বিমোক্ষোহপর্গ-২২১ গৌতম মহর্ষি: ন্যায়সূত্র, ফনিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহপৃঃ ২৩৩|

১১ বাধনা লক্ষনং দুঃখম -২১.গৌতম মহর্ষিঃ ন্যায়সূত্র, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহপৃঃ-২৩১|

১২ গৌতম মহর্ষিঃ ন্যায়সূত্র, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহপৃঃ- ৬৩||

১৩ প্রবর্ত্তনা লক্ষণা দোষাঃ -১৮,গৌতম মহর্ষিঃ ন্যায়সূত্র, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহপৃঃ ||২২৬||

রূপে গণ্য।[১৪] যে বিষয়কে নিয়ে আমাদের রাগ জন্মায় তাকে আমরা সবসময় সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করি এবং যে বিষয়কে নিয়ে আমাদের দ্বেষ জন্মায় তাকে পরিহার করার জন্য প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। প্রবৃত্তি হতে ধর্ম ও অধর্মের সঞ্চয় হয়, এই ধর্ম অধর্ম হল সুখ-দুঃখের হেতু।

সুতরাং প্রবৃত্তি হল শরীর পরিগ্রহের কারণ। প্রবৃত্তির দ্বারা সঞ্চিত ধর্ম-অধর্মের ফলভূত সুখ দুঃখ ভোগের জন্য জীব জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মগ্রহণ হল মিথ্যা জ্ঞানের নামান্তর মাত্র। ন্যায় দর্শন ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে এই মিথ্যা জ্ঞানের অপগত করার কথা বলেছেন। মিথ্যাজ্ঞান অপগত হলে জীবের পূর্বে সঞ্চিত ধর্ম অধর্মের সঞ্চয় বন্ধ হয়। বস্তুত পূর্বে সঞ্চিত ধর্ম অধর্মের সঞ্চয় বন্ধ হয়। পূর্বসঞ্চিত ধর্মাধর্ম তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হওয়ার ফলে জীবদেহের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয় না। এই সুখ দুঃখ উৎপাদনে আর সামর্থ্য হয় না। ফলে সুখ দুঃখ ভোগের জন্য বা শরীর পরিগ্রহের জন্য এই সংসারে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জন্মের অপগম হলে সর্ববিধ দুঃখের নাশ হয়। সর্ববিধ দুঃখের নাশ ন্যায় দর্শনের আঙিনায় মুক্তি বা অপবর্গ।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) শাস্ত্রী, পঞ্চানন (অনূদিত): চার্বাক দর্শন (শ্রীমৎ সায়নমাধাকৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে প্রথমৎ), সংস্কৃতি পুস্তক ভান্ডার কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।
২) ভট্টাচার্য শ্রীসুখময়:পূর্বমীমাংসা দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ;১৯৮৩
৩) ভট্টাচার্য গোপীনাথ:ভারতীয় দর্শন ও তার বিশিষ্ট পটভূমিকা, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ১৯৯৫
৪) স্বামী রামসুখদাস: শ্রীমদভগবদগীতা সাধক-সঞ্জীবনী, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর-১৯৯৫।
৫) শাস্ত্রী, বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দু :মনুসংহিতা সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার , বিধান সরণী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১০
৬) মন্ডল, প্রদ্যোতকুমার:ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ।
৭) ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র: ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দ।
৮) ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ:দন্ডনীতি, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ 2023
৯) ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র:স্নাতক নীতিবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৭
১০) গুপ্ত দীক্ষিত: নীতিবিদ্যা, পরিবেশক প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ 2009
১১) বাগচী, দীপক কুমার:ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ-২০০৩
১২) চক্রবর্তী সত্যজ্যোতি (বঙ্গানুবাদ), সায়ণ মাধবব্বীয়ঃ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহঃ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা প্রথম খন্ড, ২০১৪
১৩) বাগচী, দীপক কুমার:ভারতীয় নীতিবিদ্যা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ২০০৪
১৪) শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন: চার্বাকদর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৩
১৫) Hiriyanna, m". Philosophy of values, the cultural Heritage of India, vol. III p. 645-647,1968.
১৬) V. Raghavan: The Monu samhita, the cultural Heritage of India, vol. II, 1969, P-341-343,1978.

[১৪] গৌতম মহর্ষিঃ ন্যায়সূত্র, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহপৃঃ ২২৫।।